Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 224 - 229
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নাট্যে উপেক্ষিত নজরুল

শিবশক্তি শীট
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : sibsakti.ecil@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Neglected, Rebel, The renaissance, Cleric, Aleya, Bidyapati, Half-Arena, Timeless, Drama.

Abstract
Kazi Nazrul Islam was a born rebel. His essence is captured in poetry and song. His wanderings in the entire branch of Bengali literature. As much as his songs and poems are discussed, not so much is discussed about his plays or songs. Many parts of Bengali literature are rich in his works. His dramas are precious jewels in various collections. He composed dramas, palagans almost parallely for people of all ages from children to teenagers. The number of plays written by him is about hundred. Although some of his plays are still undiscovered. Apart from composing dramas, his achievements are immense in all fields from composing songs suitable for dramas, giving tunes, giving voice to songs. Not only his own drama, but also accompanied the drama of others in parallel. However, this contribution of his has not been studied anywhere from the pages of books to the stage. Playwright Nazrul is almost forgotten by the present generation. I left the next generation. This article discusses the aspect of Nazrul that is neglected in the play.

Discussion

পরাধীন ভারতে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ-যন্ত্রণা, বঞ্চনা-লাঞ্ছনাকে তুলে ধরতে প্রদীপ শিখার মতো জ্বলে ওঠে তাঁর কলম; রণক্লান্ত বিপ্লবী বীরের হুংকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠস্বর; সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের শিখাকে নিভিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার জয়গান আনে তাঁর সৃষ্টি; ম্রিয়মান বাঙালির অন্তরে ঢেলে দেয় অমৃতবহ্নি, নতুন ভোরের স্বপনে-জাগরণে বাজে তাঁর গীতলহরী; তিনি আর কেউ নন, আমাদের প্রাণের কবি, জাগরণের কবি, সাম্যের কবি, ‘জাতীয় কবি’, ‘বিদ্রোহী কবি’ কাজি নজরুল ইসলাম। আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। ‘কবি ও অকবি যাহা বল’ তাঁরে, তাঁর লিখনশৈলী ধূমকেতুর ন্যায় আলোকশিখা দিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

বাংলা সাহিত্যের সমগ্র শাখায় নজরুলের অবস্থান। কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, রঙ্গালয়, নাটক, মঞ্চ, চলচ্চিত্র, রেডিওতে, এমনকি অভিনয়, সাংবাদিকতাসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবকটি শাখায় তাঁর বিচরণ। তাঁর সংগীত ও কবিতা নিয়ে যতখানি মূল্যায়ন হয়েছে বা হচ্ছে, নাটক ও চলচ্চিত্রে তাঁর যে অবদান আছে, সেদিকটি সেই অর্থে আলোচনা হয় না। অথচ তৎকালীন বাংলা নাটকের ইতিহাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে তাঁর অবস্থান। তাঁর নাটকে স্বদেশ ভাবনা থেকে জাতীয় চেতনা উন্মেষের বীজ কী-ই ছিল না তাতে!

রেনেসাঁ কবি মধুসূদনের হাত ধরে আধুনিক বাংলা নাটকের শিল্পিত ও সার্থক নাট্যরচনার পথ চলা শুরু হয়। লক্ষণীয়, নজরুল তাঁর পূর্বসূরি মধুসূদন থেকে নয়, বরং আবহমান পল্লী-বাংলা নাটকের আবহ থেকেই নাটক রচনার রসদ সঞ্চয় করেছিলেন। বাঙালির সনাতন ঐতিহ্যের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর শিকড়। তাঁর নাটক বিচার করা সার্থক হয়ে ওঠে প্রাচীন শিল্পসৌকর্যে নৃত্যগীত ও কাব্যময় বাংলা নাট্যের প্রেক্ষাপটে। নজরুল ৮৪টি নাটক ও নাট্যকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর লেখা নাটক-নাটিকা-কমিক-নক্সা ৫৯টি এবং তাঁর সংগীত রয়েছে অপরের লেখা এমন নাটকের সংখ্যা ২৫টি। বাংলা নাট্য জগতে নজরুলকে পাওয়া যায় রচয়িতা, নির্দেশক, সংগঠক, অভিনেতা, উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক, সংগীতাচার্য হিসেবে। বাংলা নাটকের ইতিহাসকাররা নজরুলকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দুখি নজরুল জীবনের শুরুতে জীবিকার তাগিদে লেটো দলে যোগদান করেন। সে দলের সর্দার। লেটো গানে পাচনা পালা এবং লোকজীবনের সমস্ত ভাবনার মহৎ প্রকাশ ঘটে। দুখি নজরুলের তাই হল। দলের তাগিদে পালা রচনার মাধ্যমে সাহিত্য রচনার হাতে খড়ি পড়ল। অর্থাৎ নাটক লিখে সাহিত্যজগতে অভিষেক হল তাঁর। ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদলের ৪৯ নম্বর বাঙালি পলটনের সৈনিক রূপে যুদ্ধে যান। সেখানে এক পাঞ্জাবি মৌলবীর মুখে হাফিজের কবিতা আওড়ানো শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং ওই মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসি শিখতে শুরু করেন। ১৯১৯ দেশে ফিরলেন। 'হাবিলদার' কবির প্রথম কবিতা হাফেজ-অনুসরণে লেখার পর স্বীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসে প্রকাশ পেল 'অগ্নিবীণা' (১৯১৯)। এরপর —

> "দমকা-হাওয়ায় কবি শুধু অগ্নিবীণা বাজাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি 'ধূমকেতু'ও ছাড়িলেন। কবিতার ঝঙ্কার যাহাদের কানে কোনদিন পশিবে না তাহারাও 'ধূমকেতু'র ঝাপটা হইতে রেহাই পাইবে না। 'ধুমকেতু' পাক্ষিক পত্রিকা (১৯২২)। ...ধূমকেতুর জন্য কবি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।"[১]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুর জেলে বন্দি অবস্থায় তিনি প্রথম নাটক লেখেন। কবি পাণ্ডুলিপিটি জেলের বাইরে পাঠালে, সেটি হারিয়ে যায়। তবে তার একটি গান 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে জেলখানার বন্দিরা একটি নাটকের অভিনয় করেন। এরপর নাট্যকার ও অভিনেতা নজরুলকে সকলে আবিষ্কার করতে শুরু করেন।

নজরুল ছিলেন অগোছালো প্রকৃতির। তাই দলের পরিবেশনার জন্য তাঁর লেখা সবগুলো পালার হদিস মেলেনি, কালের অতল গ্রাস থেকে মাত্র ১৩টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'চাষার সঙ' (১৯১০), 'রাজপুত্রের সঙ' (১৯১০), 'রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ' (১৯১০), 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৯১০-২০), 'শকুনি বধ' (১৯১১), 'ঠগপুরের সঙ' (১৯১১), 'মেঘনাদ বধ' (১৯১১), 'কবি কালিদাস' (১৯১২), 'দাতা কর্ণ' (১৯১২), 'বিদ্যাভূতুম' (১৯১২), 'আকবর বাদশাহ' (১৯২০-২১) প্রভৃতি। লেটোর ধারায় নতুনত্ব সৃষ্টির অধিকারী তিনি। আর সে কারণেই ওই বয়সেই তিনি 'গোদা-কবি' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লেটো পালা রচয়িতা আখ্যায় ভূষিত হন। নাটক রচনায় তাঁর কালজয়ী প্রতিভার বিকাশ ঘটে ঠিক এই সময়ে।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুল যোগদান করেন। এই সময় তিনি বেশ কিছু শ্রুতি নাটক তথা রেকর্ড নাটক রচনা করেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের আনন্দদানের জন্য তাঁর অনেকগুলো নাটক লেখার কথা জানা যায়। তবে আন্দোলনের কারণে অধিকাংশ শ্রুতিনাটক গ্রামোফোন কোম্পানি সংরক্ষণ করার অবকাশ পায়নি। হারিয়ে যাওয়া সেই নাটকগুলোর মধ্যে, 'খুকী ও কাঠবেড়ালী' (১৯৩০), 'জুজুবুড়ির ভয়' (১৯৩০), 'খাঁদু দাদু' (১৯৩০), 'কালোয়াতী কসরৎ' (১৯৩৩), 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩), 'ভ্যাবাকান্ত' (১৯৩৬), 'ঈদল-ফিতর' (১৯৩৬), 'প্ল্যানচেট' (১৯৩৬), 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৭), 'কলির কেষ্ট' (১৯৩৮), 'আল্লাহর রহম' (১৯৩৯), 'বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা' (১৯৩৯), 'কবির লড়াই' (১৯৪০), 'বনের বেদে' (১৯৪০), 'বাঙালির ঘরে হিন্দি গান' (১৯৪১) প্রভৃতি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লক্ষ্যণীয়, তাঁর অধিকাংশ রেকর্ড নাটকের নামকরণে কৌতুকময়তার ইঙ্গিত বর্তমান। ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবি শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে এগুলি লিখেছিলেন।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের পরপরই কাজি নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সাহচর্যে আসেন। ১৯৩১ সাল, এই সময় তিনি কয়েকটি মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকে দেখা গেল প্রকরণশৈলি নান্দনিকতায় বিশেষ পরিবর্তন। আগে বলেছি, তাঁর সবকটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সমালোচকগণ তাঁর সৃষ্ট শতাধিক নাটকের কথা বললেও তারমধ্যে ৮০টির মতো নাটক পাওয়া যায়। উল্লিখিত নাটকগুলো ছাড়াও কবির আরও কিছু নাটক হল— 'ঝিলিমিলি' (১৯২৭), 'সেতুবন্ধ' (১৯২৭), 'ঝি ও চাকর' (১৯২৭), 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' (১৯৩০), 'শিল্পী' (১৯৩০), 'ভূতের ভয়' (১৯৩০), 'শাল পিয়ালের বনে (১৯৩০), 'আলেয়া' (১৯৩১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৩৩), 'নবার নামতাপাঠ' (১৯৩৩), 'কে কি হবে বল' (১৯৩৩), 'দেবীস্তুতি' (১৯৩৮), 'জাগো সুন্দর' (১৯৩৮), 'অতনুর দেশ' (১৯৩৮-৩৯), 'চির কিশোর' (১৯৩৮-৩৯), 'কাফেলা' (১৯৩৮-৩৯), 'বাসন্তিকা' (১৯৩৯), 'বিজয়া' (১৯৩৯), 'মধুমালা' (১৯৩৯), 'হরপ্রিয়া' (১৯৩৯), 'গুল বাগিচা' (১৯৪০), 'ঈদ' (১৯৫৮) প্রভৃতি।

নজরুল-নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্ত একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "যতদূর জানা গেছে, কাজী নজরুল ইসলামের রচনাকে মঞ্চস্থ করার প্রথম কৃতিত্ব সতু সেনের প্রাপ্য। নজরুলের 'আলেয়া' নাট্য-নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) একটি অপেরাধর্মী নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। সুরকার ছিলেন কবি স্বয়ং।"[২]

নজরুল মঞ্চায়নের বিষয়টি শুধু বড়ো করে দ্যাখেন নি, নাটকের পাঠযোগ্যতাকে স্থান দিয়েছেন। দেখা ও শোনার এই অদ্বৈতটি রূপটি গড়ে উঠেছে তাঁর নাটকে। আর এখানেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য এবং শৈল্পিকদিকটি ধরা পড়ে।

সমালোচকরা বলেন, 'আলেয়া' ও 'মধুমালা' পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি তাঁর সর্বাধিক মঞ্চসফল নাটক। 'আলেয়া' নজরুলের দ্বিতীয় নাটক। এটি প্রেমের আখ্যাননির্ভর কাহিনি। নাটকের নায়িকা জয়ন্তী এবং মীনকেতু ও উগ্রাদিত্যের ত্রিভুজ প্রণয়কাহিনি নাটকের আখ্যানকে পরিনামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এটির প্রকাশ ১৯৩১ সালে। সেকালের সেরা রঙ্গালয় কোলকাতার নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'ঝিলিমিলি' বাস্তব জীবনের প্রেম-বিরহ ও কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা। এটিকে রূপক বলা যায়। 'সেতুবন্ধ' আরেকটি রূপক-সাংকেতিক ধারার নাটক। তিন দৃশ্যের একটি একাঙ্কিকা। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রকৃতি কীভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে এটি তারই দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনেকখানি। নাটকের শেষাংশের একটি সংলাপে পদ্মা যন্ত্রকে বলছে— 'জানি যন্ত্ররাজ। তুমি বারে বারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে'। 'মধুমালা' নজরুল মানসের একেবারেই ভিন্নসত্তার। রূপকথার মধুমালা-মদনকুমার ও কাঞ্চনমালার গল্প নিয়ে মধুমালা রচিত। দৃশ্য ও কাব্যের সংমিশ্রণে এটি পরিপূর্ণ দৃশ্যকাব্য হয়ে উঠেছে। নজরুলের 'সাপুড়ে' গল্প অবলম্বনে 'নীলাখ্যান' নাটকটি নির্মিত। নাটকটি সর্বস্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই নাটকের কাহিনির প্রেক্ষাপটে বেদে-বহর হলেও কবি নজরুল অন্তস্রোতে এমন একটি সর্বজনীন বীজ ভাসিয়ে দিয়েছেন যা স্পষ্টতই গোটা মানবজাতির সর্বকালকে ছুঁয়ে যায়।

নজরুলের সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে গেলে শুরুতে একটু কঠিন মনে হয়। যেমনটা রবীন্দ্রনাথের নাটকের ক্ষেত্রে হয়। তাঁর সুবিশাল নাট্যভাণ্ডারের কথা ক'জন বা জানে! তাঁর নাটক সেভাবে চর্চিতই হয়নি, এমনকি অনেক নাটক এখনও অনাবিষ্কৃত কিংবা যথার্থ সংরক্ষণ হয়নি। এটি সত্যি আফশোসের বিষয়।

বাংলা গীতিনাট্যের জগতে নজরুল এক মহীরুহ। সেই সময় অনেক নাট্যকার এই ধরনের নাটক লিখলেও নজরুল-স্থানীয় কেউ ছিলেন না। সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "...গীতিনাট্য লেখবার যোগ্যতা জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে নজরুল ইসলামের চেয়ে বেশী আর কারো নেই। প্রথমতঃ তিনি কবি, তা ছাড়া তিনি সুরশিল্পী। ...গল্পাংশ খুব ক্ষীণ; বহু গানের মাঝে মাঝে অল্প ডায়ালগ ছড়ানো। টেকনিকের দিক থেকে একেবারে খাঁটি musical

> comedy ...রঙ্গমঞ্চের three dimensional দৃশ্য পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ (সতু সেন) দেখে শুধু মুগ্ধ হতে হয়।"[৩]

নজরুলের পালা, গীতিনাট্য, গীতি-বিচিত্রা, নাটক-নাটিকা, ইত্যাদি নাট্যচর্চার বিভিন্ন দিক সূচিত করে। বিচিত্র বিষয়কে তিনি নাটকের অঙ্গীকৃত করেছেন। শুধু নাটক লিখেছেন তাই নয়, অভিনয়, নির্দেশনা, পরিচালনা, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদিতেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন; সবকিছুর মধ্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন; এমন প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর নাটক যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমন প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো সমালোচককে বলতে শোনা যায়, নাটকের কলা-রীতি, শিল্প-সৌকর্য ও চিরন্তন আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি অতটা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। সমালোচকদের এই বদ্ধমূল ধারণা ঠিক নয়। নজরুল পালার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও অচিরেই শ্রুতিনাটক মঞ্চনাটক প্রভৃতি পারঙ্গমতার পরিচয় দেন। সেকাল কিংবা বর্তমানে তাঁর নাটক সম্পর্কে বিজ্ঞজনেরা খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। এমনকি তৎকালে বাংলা নাটকের আরেক দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকও নজরুলেরই মতো মঞ্চায়নে উদ্যোগ দেখা যেতো না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিজের নাটক মঞ্চায়ন করেছেন, নজরুল তা পারেননি সংগত কারণেই। সে সময় নাট্য পরিচালকগণ অন্য রচয়িতার নাটকের সংগীত নিতেন কবির কাছ থেকে কিন্তু কবির নাটক মঞ্চস্থ করতেন না। এমন নাটকের সংখ্যা প্রায় ৫০। যেমন— শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের জন্য ৭টি, 'রক্তকমলে'র জন্য ৯টি, 'হর পার্বতী'র জন্য ১১টি সংগীত লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন।

নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ী নজরুলকে পছন্দ করতেন। তাঁর 'সীতা' নাটকের পোশাক নির্বাচনে সাহায্য করেছিলেন নজরুল। আবার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-নজরুল ইসলাম-মন্মথ রায় ত্রয়ী নাট্যকাররূপে বাংলার জনমানসে বিরাজ করলেও নজরুলকে যেন কবিতা আর সংগীতেই মানায়, এমনতরো চিন্তা বাংলার ভাগ্যাকাশে কালোমেঘকে সূচিত করে। এই ত্রয়ীর সখ্যতা ছিল বিচিত্র। শচীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯২ সালের ২০ জুলাই, নজরুলের ১৮৯৯-এর ২৪ মে এবং মন্মথের ১৮৯৯-এর ১৬ জুন। মাত্র কয়েকদিনের ছোট মন্মথকে নজরুলের লেখা একটি পত্র অভিভূত করে তোলে। মন্মথ রায় তখন ওকালতির পাশাপাশি জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। নাটকও লিখছেন। এমন সময়ে নজরুলের একটি পত্র—

> "এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দু চোখে আনন্দ যেমন ধরেনা, তেমনি আনন্দ দু চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়— এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভাল করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি। ইতি। 'নবনাটিকা' দর্শনাকাঙ্ক্ষী। নজরুল ইসলাম।"[৪]

কবির জীবনকাল ১৮৯৯-১৯৭৬ হলেও, ১৯৪২-এর পর থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন বাকরুদ্ধ, স্থবির। ১৯৭৫ এ স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে কবিকে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। সেখানেই তিনি মারা যান। জীবনের এই স্বল্প পরিসরে নজরুল সাহিত্যের মাঝে তাঁর লেখা শতাধিক নাটক আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে। নাট্য জগতের সাথে তাঁর কত বিচিত্র যোগ! আবার, নাটকে সংগীতের প্রয়োগ-প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর তুলনা হয়না। একবার সরযুবালা দেবী পড়লেন নজরুলের মুখোমুখি। সে কি কাণ্ড –

> "রক্তকমলে মমতার ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। ঐ ভূমিকার জন্য কাজীদা পাঁচখানি গান লিখে সুর করে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে গানগুলি স্টেজে বেশ উতরে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তারপর নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'মহুয়া' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করার ডাক এলো আমার কাছে। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। কাজীদা ঐ নাটকে আমার জন্য সাত-আটটি রাগপ্রধান গান লিখেছিলেন। এর সব ক'টি গান স্টেজে উঠে আমাকে গাইতে হবে শুনে আমি বেঁকে বসলাম একেবারে, 'ও আমি কিছুতেই পারবো না।' ...আমি যতো বলি, 'না, হবে না'। উনি তাতোই জেদ ধরে বলেন, 'হ্যাঁ, হতেই হবে, না হলে আমার নাম পালটে দেবো।' তোমায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> কিচ্ছুটি করতে হবে না-লাফাতে হবে না, ডিগবাজী খেতে হবে না, একপায়ে দাঁড়াতেও হবে না, শুধু আমার সঙ্গে গাইবে আর হাসবে।' ...নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে মাত্র তিন দিনের মধ্যে ঐ অতোগুলি রাগপ্রধান গান একেবারে পাখী পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে দিলেন কাজীদা।"[৫]

নজরুল সমগ্র বাংলায় সংগীতের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মতো বিশ্বে আর কোনো সংগীতকার আছে কিনা সন্দেহ। যে রবীন্দ্রনাথের গানে কণ্ঠ দিয়ে নজরুলের সংগীতের হাতে খড়ি, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সংখ্যা ২২৩২টি। সেখানে নজরুলের গানের সংখ্যাটা তিন থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। যদিও নজরুলের ৩০৯৪টি সংগীত উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি নাটকের সংখ্যা ১০০ ছাপিয়ে গেলেও উদ্ধার হয়েছে কিছু মাত্র।

নাটকের অন্যতম একটি উপাদান সংগীত। নজরুল-নাটকে এই সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এর পশ্চাতে মূলত দেশজ ঐতিহ্য ও নাট্য সংস্কৃতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর সময়ে বাংলায় যাত্রা এবং নাট্যরীতির প্রভাবের জোয়ার এসেছিল। অর্থাৎ কবি লেটো গান, পাঁচালি, যাত্রা, গীতিকা, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি বাংলা নাট্য আঙ্গিকের পরিবেশনা উপভোগ করেছিলেন। ফলে, এ সকল প্রভাব তাঁর নাটকে অঙ্গীভূত হওয়াটা স্বাভাবিক।

তার নাটকে সংগীতের সংখ্যা যদি বিচার করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আধুনিককালে বাংলা নাটকে এত বিপুল সংখ্যক সংগীতের ব্যবহার কেউ করেননি। তাঁর 'আলেয়া' নাটকে ২৮টি; মধুমালাতে ৪৩টি; বিদ্যাপতিতে ২১টি; মদিনাতে ৪৩টি সংগীতের সন্নিবেশ ঘটেছে। এমন উদাহরণ বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিরল। নাটকে সংগীতের আধিক্যের দিকটি তুলে বহু সমালোচক তাঁর কোনো কোনো নাটককে গীতিনাট্য কিংবা গীতি-আলেখ্য রূপে অভিহিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু গীতের আধিক্য, সেটা তো আজকের নয়; বাংলা সাহিত্যে হাজার বছর পূর্বে আসরে পরিবেশনামূলক গেয় কাব্যের অভিনয় রূপটি তাহলে আগে বিবেচনার দরকার। কারণ বাংলা নাটকের প্রাণ, সে তো সম্পূর্ণ লুকিয়ে আছে গীতের শরীরে।

নজরুলের অধিকাংশ নাটকে সংগীতের সাথে সাথে দৃশ্যের বৈচিত্র্যও বিদ্যমান। বিষয়বস্তু, ঘটনা, দৃশ্য, সংগীত ইত্যাদি বৈচিত্র্যের জন্যই হয়ত সেই সময় বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনালগ্নে তাঁর কয়েকটি নাটককে চলচ্চিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৭-এ 'বিদ্যাপতি' নাটক অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্র 'বিদ্যাপতি' নির্মিত হয়। ১৯৩৯ 'সাপুড়ে' গল্পের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয় সিনেমা। গল্পটির নাট্যরূপ 'নীলাখ্যান'। একই ভাবে তাঁর 'মদিনা' নাটকটিরও চলচ্চিত্ররূপ নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

নজরুল ছিলেন অসামান্য মনের অধিকারী। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের প্রাচীর সরাতে চেয়েছেন বারংবার। সেই দর্শন তাঁর নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মুসলিমদের জন্য লিখলেন ঈদের নাটক 'ঈদ'। আবার হিন্দুদের জন্য সম্পূর্ণ হিন্দিতে লিখলেন 'জন্মাষ্টমী'। তিনি বাঙালির রক্তে বিপ্লবের অগ্নি সঞ্চার করেছিলেন। যতদিন পৃথিবীতে বিপ্লবীসন্তান বেঁচে থাকবেন, ততদিন রক্তে প্রতিধ্বনিত হবে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার আগুন। অথচ আমরা এই কালজয়ী কবির সৃষ্টিকে নানাভাবে উপেক্ষা করে চলেছি। তাঁকে আমরা কতটা জানতে পেরেছি বা জানার চেষ্টা করছি এখনও! তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা কজন জানে!

> "দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায় যে, একজন আরেকজনকে টেনে তুলছে ওপরে। এবং সে টেনে তোলা আরও মহত্তর হয়, যখন যিনি টেনে তুলছেন, তিনি খ্যাতির শীর্ষ দেশের সমাসীন— যাকে টেনে তুলছেন, সে রয়েছে অখ্যাত, অবহেলিত।"[৬]

তিনি যে কলমের তরবারি দিয়ে বিপুল ও বৈচিত্র্য রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার অনেকটাই এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে। পিছন ফিরলে দেখা যায়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, যাত্রা, পালা গান, লেটো গান, কবি গান ছিল বাঙালি জাতিসত্তার গোড়া পত্তনে সংস্কৃতির শেকড়ের একমাত্র শিল্পমাধ্যম। এই ভূখণ্ডে ইংরেজদের আগমন না ঘটলে হয়তো পুরোপুরি ভাবেই বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভাবধারায় আমাদের নাট্য নিকেতন গড়ে উঠত।

সর্বোপরি, নজরুলের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকীর সময়ের নিরিখে নাট্যানুষ্ঠান নয়; প্রতিবছর টিভি চ্যানেল আর পত্র-পত্রিকায় তাঁর নাটক নিয়ে শুধু সংবাদ আর লেখালেখি নয়; বিশেষ কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে নজরুলের ব্যক্তিমানস ও তাঁর সৃষ্টি নাটককে জনমানসে প্রচারমুখী করে তুলতে হবে। নাট্য-পুস্তিকার প্রকাশ বহুগুন বৃদ্ধি করতে হবে। তা না-হলে তিনি পড়ে থাকবেন অন্তরালে। নজরুল সংগীতের যতটা চর্চা হচ্ছে, তাঁর সৃষ্ট নাটককেও সমস্থানে নিয়ে আসার জন্য পরিচালক, নির্দেশক থেকে নাট্যমোদী সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দুই বাংলায় এখনও পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটা নাট্যদল তাঁর নাটক নিয়ে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে, তা না হলে কবির সৃষ্টির প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবে।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ, দশম মুদ্রণ, জুন, ২০১৯, পৃ. ২৯৮-২৯৯

২. দাশগুপ্ত, অমিতাভ (সম্পাদিত), ‘সতু সেন : আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : মহালায়া ১৩৬৭, পৃ. ১৫০

৩. বসু, বুদ্ধদেব, ‘নাচ ঘর’, ১৯৩১, ৯ পৌষ ১৩৩৮

৪. ঘোষ, জয়তী, ‘মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৯

৫. দেবী, সরযূবালা, প্রবন্ধ- ‘কাজীদার স্মৃতিকথা’, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ‘নজরুল স্মৃতি’, সাহিত্যম, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২৭-২২৮

৬. রায়, মন্মথ, প্রবন্ধ- ‘উদার নজরুল’, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ‘নজরুল স্মৃতি’, সাহিত্যম, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯